ভারতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সুন্দরবন এবং রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প

আরিফুজ্জামান তুহিন

বাংলাদেশের বাগেরহাটের শ্বাসমূলীয় এবং প্রতিবেশগতভাবে সংবেদনশীল সুন্দরবনসংলগ্ন রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাকে ঘিরে দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাপক প্রতিবাদ ও সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ বাংলাদেশ ও ভারত সরকার বাংলাদেশের ত্রিশজন সাংবাদিককে দুটি বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য ভারত সফরে নিয়ে যায়। সেই গণমাধ্যমকর্মী দলের একজন সদস্য তাঁর সফর অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে এই লেখা লিখেছেন।

এই সফরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এনটিপিসির মালিকানাধীন সিপাত এবং আদানি গ্রুপের তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে। কয়লাচালিত এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির প্রথমটি ছত্তিশগড়ের সিপাতে অবস্থিত আর দ্বিতীয়টি মহারাষ্ট্রের গুণ্ডিয়ায়। আমরা দুদিনে (২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর) দুই ঘণ্টা করে মোট চার ঘণ্টা বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি পরিদর্শনের সুযোগ পাই। ভারত সফরের অবশিষ্ট সময় আমাদের পার হয়েছে মূলত দীর্ঘ ট্রেন ও বাসভ্রমণে। মাঝের এক দিন আমরা কলকাতায় কাটিয়েছিলাম। সফর শেষে আমরা বাংলাদেশে ফিরে আসি ২৬ সেপ্টেম্বর।

ভারত সফরের দুই আয়োজক দেশের প্রত্যাশা ছিল, সাংবাদিকরা ভারতের দুটি বৃহৎ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সরেজমিনে দেখে এসে তার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরবেন তাঁদের গণমাধ্যমগুলোতে। সে জন্য বলে রাখা ভালো, কোন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব কোন জনগোষ্ঠী ও তার পরিবেশ-প্রতিবেশের ওপর কী রকম পড়বে বা পড়ছে, তা শুধু চোখে দেখে চটজলদি বোঝার কোনো ব্যাপার নয়। তা বুঝতে হলে দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তবু এই সরেজমিন পরিদর্শনে সাংবাদিক হিসেবে আমি যা দেখেছি, ভারতের সংশ্লিষ্টরা যা বলেছেন এবং দেশে ফিরে এসে আমার গণমাধ্যম সহকর্মীরা পরিদর্শিত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটি সম্পর্কে যা বিভিন্ন সময় লিখেছেন, এ সব কিছুর ওপর ভিত্তি করেই আমার এ লেখাটি। এর পাশাপাশি আলোকপাত করা হয়েছে সুন্দরবন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে এবং কয়লাভিত্তিক রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কী ধরনের সংকট তৈরি করবে, সে ব্যাপারে। তবে মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত আলোকপাত জরুরি, যা সেখানে মোটাদাগে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে যৌক্তিক করেছে।

> আমাদের দেশের সরকারের সংশ্লিষ্টরা আমাদের বারবার আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যখন কয়লা পরিবহন করা হবে, তখন সেই জাহাজ সম্পূর্ণ ঢাকা থাকবে। সেখান থেকে কোনো কয়লা বাতাসে বা বৃষ্টির পানিতে অথবা কোনোভাবে সুন্দরবনের নদীগুলোতে পড়বে না। অথচ ভারতের 'সুপারক্রিটিক্যাল' কেন্দ্রের কয়লা পরিবাহী রেলে করে যে কয়লা আসছে, তার ওপর কোনো ত্রিপল-জাতীয় ঢাকনা নেই। তেমন কিছুই সেখানে চোখে পড়ল না। তবে কেন্দ্রের ভেতর ফুলের বাগান করা হয়েছে। সবই সুন্দর। ছিমছাম।

ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উন্নয়ন

ভারতের গত পাঁচ দশকে ব্যাপক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এ রকম প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ধারণা করা হচ্ছে, আগামী ত্রিশ বছরে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে যাবে। প্রায় ১২৬ কোটি মানুষের ভারতের বিশাল অর্থনীতির যে মহাযজ্ঞ, তা এগিয়ে নিতে দরকার বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। আর সেই কাজটিতে গত এক দশকে ভারত অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বিদ্যুৎ খাতে ভারতের অসামান্য সাফল্যের পেছনে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে এই খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তবে কম খরচে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে ভারত কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। প্রায় জনমানবহীন স্থানে গড়ে তোলা এসব কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশটির প্রাণ হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

ভারত ঘণ্টাপ্রতি গড়ে প্রায় ২ লাখ ৩৭ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এর মধ্যে কয়লা দিয়েই উৎপাদন করছে ১ লাখ ৪০ হাজার ৭২৩ মেগাওয়াট, যা মোট বিদ্যুতের ৬০ শতাংশেরও বেশি। কয়লা থেকে উৎপাদিত এই বিদ্যুতের দাম ভারতের মুদ্রায় আড়াই রুপি ও বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে তিন টাকা। ভারতের নিজস্ব কয়লাখনি থাকায় ও কয়লার দাম কম হওয়ায় দেশটিতে ব্যাপক মাত্রায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। যদিও এসব কেন্দ্র থেকে উদ্‌গত পরিবেশদূষণ দেশটির জন্য নতুন এক ভাবনা সামনে এনে দিয়েছে, তা হলো পরিবেশ ও কয়লাভিত্তিক উন্নয়ন– এর মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে তারা।

আমাদের ভারতের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা দুই ভাগে আলোচনা করা হবে এই অংশে। এ ক্ষেত্রে আমাদের ক্রমানুযায়ী ভ্রমণ এবং পরিদর্শন গন্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

আমাদের ভ্রমণ ও প্রথম পরিদর্শন গন্তব্য: ছত্তিশগড়ের সিপাত বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রথমে ছত্তিশগড়ের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পৌঁছেই সোজা চলে আসতে হয় হাওড়া রেলস্টেশনে। সেখানে এসে একটু বসার মতো জায়গাও পাইনি আমরা। স্বভাবতই রেলস্টেশনে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এভাবে টানা আড়াই ঘণ্টা সময় কাটানোর পর সেই রাতেই ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া আজাদ হিন্দ রেলে আমরা অবশেষে চেপে বসি।

সারা রাত রেলভ্রমণের পর ২২ সেপ্টেম্বর খুব ভোরে আমরা গিয়ে পৌঁছি ঝাড়খণ্ডের বিলাসপুরে। এর পরপরই আরেকটি বাসে চড়ে রওনা দেই এনটিপিসির বিদ্যুৎ কেন্দ্র ছত্তিশগড়ের সিপাতের উদ্দেশে। সকাল আটটার দিকে আমরা সেখানে অবস্থিত এনটিপিসির নিজস্ব রেস্টহাউসে পৌঁছি। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

সারা রাতের রেলভ্রমণ আর সকালের বাসযাত্রার পর এনটিপিসির আরামদায়ক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি কক্ষে এসে দামি প্রাতরাশের পর আমাদের দলের ক্লান্ত-অবসন্ন অধিকাংশ সদস্যই ঘুমিয়ে পড়েন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির স্থাপিত উৎপাদনক্ষমতা ২ হাজার ৯৮০ মেগাওয়াট। কেন্দ্রটির অপারেশন রুমে নিয়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে আমাদের বিদ্যুতের নানা ধরনের বিষয় সম্পর্কে বোঝানো হয়। এরপর বয়লার ও অন্যান্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় কোনো প্রকার ক্যামেরা ব্যবহারের ওপর ছিল কড়াকড়ি নিষেধাজ্ঞা।

পরিদর্শন শেষে বিকেলে শুধুমাত্র টিভি রিপোর্টারদের একটি বিল্ডিংয়ের ওপর নিয়ে যাওয়া হয় এবং কিছু সময় দেওয়া হয় পুরো কেন্দ্রের বাইরের দিক ভিডিও করার জন্য। আর আমরা ফিরে আসি আবার এনটিপিসির আরামখানায়। নিরাপত্তার অজুহাতে আমাদের কাউকে অবশ্য কোথাও যাওয়া কিংবা স্থানীয় কারো সাথে কথাও বলতে দেওয়া হয়নি। উপরন্তু পরিদর্শন পরিকল্পনাটিও এমনভাবে করা হয়েছিল, যেন আমরা কেউ কোথাও যাওয়ার সুযোগও না পাই। এতে আমাদের জন্য ভারতের বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে কিছু স্থান পরিদর্শন ছাড়া চোখ-কানা খোলা রেখে অন্য কিছু জানার অবকাশ ছিল না।

আমাদের ভ্রমণ ও দ্বিতীয় পরিদর্শন গন্তব্য: গুণ্ডিয়ার তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্র

রাতের খাবার না খেয়েই ২২ সেপ্টেম্বর রাতে আমাদের সিপাত ছেড়ে মহারাষ্ট্রের উদ্দেশে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেসে চেপে বসতে হয়েছিল। সে জন্য বাসে চড়ে আমরা সিপাত থেকে বিলাসপুরে রওনা দিয়েছিলাম। অবশ্য রেলের ভেতরে আমাদের রাতের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সারা রাত রেলভ্রমণ শেষে আমরা মহারাষ্ট্রের নাগপুরে পৌঁছি ২৩ সেপ্টেম্বর সকালে। সেখানে পাঁচতারা হোটেল র‍্যাডিসন ব্লুতে আমাদের রাখা হয়েছিল।

ওই দিন সকাল নয়টায় আমাদের গুণ্ডিয়া জেলার তিরোধায় যাওয়ার কথা। প্রচণ্ড গরম। তাপমাত্রা ৩৪-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। আমাদের জন্য রাখা ভলভো বাসে চড়ে দেখা গেল এসি কাজ করছে না। এ রকম বাসে এসি কাজ না করলে কোনোভাবেই সেখানে থাকা যায় না। কারণ জানালা খোলার কোনো উপায় থাকে না। এ রকম সাধারণত হয় না। তার পরও হলো! এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় নিয়ে অবশেষে এসি মেরামত করা হলো।

এরপর আমাদের যাত্রা শুরু হলো নাগপুর থেকে গুণ্ডিয়ার তিরোধা। পথ ১০০ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগল কম করে হলেও তিন ঘণ্টা। বাস যেন গরুর গাড়ির মতো যাচ্ছিল। আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ইচ্ছা করেই এত ধীরগতিতে বাসটি চলছে। রাস্তায় তেমন কোনো যানবহনও ছিল না। একদম শূন্য। গড়ের মাঠ বলতে পারেন। উপরন্তু রাস্তার অবস্থাও অনেক ভালো। আলাদা লেনের ব্যবস্থা। যেখানে বাজার বা লোকালয়, সেখানেই ফ্লাইওভার। সে কারণে জ্যামে পড়ার কোনো কারণ নেই। তবু ১০০ কিলোমিটারের রাস্তা যেতে আমাদের লাগল কমপক্ষে তিন ঘণ্টা।

গুণ্ডিয়ার এই কেন্দ্রটির মালিক ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবচেয়ে আস্থাভাজন কোম্পানি আদানি গ্রুপ। এখান থেকে ৬৬০ ইউনিট করে পাঁচ ইউনিটে মোট ৩৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হওয়ার কথা। আপাতত চারটি ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে ২৬৪০ মেগাওয়াট।

আদানি গ্রুপের কেন্দ্রে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আমাদের একটি করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ দেওয়া হয়েছিল তাদের রেস্টহাউসে। সেখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে আমরা দুপুরের খাবার খেলাম। এরপর খানিকটা বিরতি দিয়ে আমরা গেলাম বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পরিদর্শনে।

অবশ্য তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন নকশাও করা হয়েছিল ছত্তিশগড়ের আদলে। নড়চড়ার কোনো সুযোগ নেই। কোনোভাবেই স্থানীয় কোনো পরিবেশকর্মী বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলার অবকাশ ছিল না। এমনকি যে দুটি নদীর পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই নদী ও নদীসংলগ্ন কোনো অঞ্চলে সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হয়নি। স্থানীয় পরিবেশের ওপর নজরদারি করার কোনো সুযোগ রাখা হয়নি সফরকালে। আর কিছু জিজ্ঞেস করলেই এনটিপিসির গাইড হরিকিরাত সিং দিংহারা আমাদের একটি রোবটিক বাক্য বারবার বলছিলেন : *'ইয়ার, ইট ইজ অ্যাবাউট সিকিউরিটি কোশ্চেন।'*

আমাদের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মতো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর দীর্ঘ ক্লাস নিলেন কেন্দ্রের প্রকৌশলীরা। তাঁরা বারবার বললেন, 'আরে ভাই, দেশের উন্নতির জন্য আপনারা কেন বিদ্যুৎ কেন্দ্র করছেন না? আমাদের মতো করেন, দেখবেন কোথায় চলে গেছেন!' বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়ে 'অনাহূত' বিতর্কে বিরক্ত।

এ সময় জ্ঞান অর্জনের ফাঁকে ফাঁকে দেখলাম, পার্শ্ববর্তী খনি থেকে কয়লা আসে। তবে সেই কয়লাবাহী রেলের ওপর কোনো ঢাকনা নেই। একদম খোলা। বৃষ্টিতে সেই কয়লা ধুয়ে চুইয়ে চুইয়ে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাচ্ছে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যে কয়লা আমদানি করা হবে, তা সুন্দরবনের নদীর ভেতর দিয়ে আসবে। আমাদের দেশের সরকারের সংশ্লিষ্টরা আমাদের বারবার আশ্বস্ত করেছেন এই বলে যে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যখন কয়লা পরিবহন করা হবে, তখন সেই জাহাজ সম্পূর্ণ ঢাকা থাকবে। সেখান থেকে কোনো কয়লা বাতাসে বা বৃষ্টির পানিতে অথবা কোনোভাবে সুন্দরবনের নদীগুলোতে পড়বে না। অথচ ভারতের 'সুপারক্রিটিক্যাল' কেন্দ্রের কয়লা পরিবাহী রেলে করে যে কয়লা আসছে, তার ওপর কোনো ত্রিপল-জাতীয় ঢাকনা নেই। তেমন কিছুই সেখানে চোখে পড়ল না। তবে কেন্দ্রের ভেতর ফুলের বাগান করা হয়েছে। সবই সুন্দর। ছিমছাম।

> আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি বাসে ওঠার জন্য, ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু করা হলো। আর সাথে সাথেই চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করল। অথচ সংবাদ সম্মেলনে আমাদের জানানো হয়েছিল যে এই চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া বের হয় না। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এভাবে চালু হয়ে যাওয়ায় আদানি পাওয়ারের কর্মকর্তারা যেন চোখে শর্ষে ফুল দেখছিলেন।

এরপর সংবাদ সম্মেলন করলেন আদানি গ্রুপের কর্মকর্তারা। সম্মেলনে আমাদের জানানো হলো যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ চালু ছিল। অথচ কোনো ধোঁয়া দেখা যায়নি। আসলেই ২৭৫ মিটার উঁচু চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া বের হতে আমরা দেখিনি।

এতে সত্যিই খানিকটা দ্বিধায় পড়ে গেলাম। ধোঁয়া নেই কেন? আমরা যে বাংলাদেশে বসে অন্ধের হাতি দেখার মতো কত রিপোর্ট (আমি নিজেও এক ডজনের বেশি স্পেশাল রিপোর্ট বানিয়েছি বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে) করলাম, সেখানে বললাম, এ ধরনের কেন্দ্র থেকে ক্ষতিকর ধোঁয়া বের হয়। মনে মনে ভাবছিলাম, এবার থেকে লেখার

সময় আরো বেশি সতর্ক হতে হবে। সুন্দরবনের প্রতি আবেগ যতই থাকুক, পেশাদারিত্ব নষ্ট করা যাবে না। আবেগতাড়িত হয়ে কোনোভাবেই প্রতিবেদন লেখা যাবে না। সেটা সুন্দরবনের পক্ষে বা বিপক্ষের ব্যাপার না।

মনে হচ্ছিল, আগে আমরা এ রকম 'সুপারক্রিটিক্যাল' প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র না দেখেই বাংলাদেশে বসে তথাকথিত ক্রিটিক (সমালোচনা) করে এক মহা অন্যায় করেছি! পারলে তখন আমাদের সবাইকে আদানি গ্রুপের কর্তাব্যক্তিরা পারলে তওবা পড়িয়ে নেন। আর আমরা নিজেরাই পারলে যেন তওবা পড়ার জন্য মওলানা খুঁজে নেই!

তবে বাস্তবের এই আলো-ঝলকানো কেন্দ্রের সবটাই বরং আলেয়া হিসেবে অবশেষে বেরিয়ে এলো একটি সাদামাটা প্রশ্নে। আমাদের এক সহকর্মী জিজ্ঞেস করলেন, *'এই কেন্দ্রে কেন কোনো নারী শ্রমিক কাজ করে না? এখানে মাত্র ছয়জন নারী কেন কাজ করে?'* এই প্রশ্নের উত্তরে তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান সিপি শাও অসম্ভব কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মিথ্যা তথ্য দিলেন। তিনি বললেন, *'আসলে এ অঞ্চলটি শহর না। এ কারণে এখানকার নারীরা বাইরে এসে কাজ করতে চায় না।'* অবশ্য তিনি মিথ্যা বলেছেন এটা পরে ওয়েবসাইট ও অন্তর্জাল ঘেঁটে নিশ্চিত হয়েছি। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে দেখলাম, প্রতিদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করে এখানকার মানুষ মাথাপিছু আয় করে মাত্র ৩০ রুপি। তা-ও কত কষ্ট করে এই উপার্জন করে আরো দূরের শহরে গিয়ে। সে ক্ষেত্রে যদি এই নারী-পুরুষরা নিজের অঞ্চলেই কাজ পায় তাহলে কেন দূরে যাবে? এটা বুঝতে রকেট বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।[১]

এরপর করা হলো আরেকটি বিস্ফোরক প্রশ্ন। জিজ্ঞেস করা হলো, এই কেন্দ্রে এর আগে যেসব গর্ভবতী নারী এখানে কাজ করেছেন, তাঁদের ভ্রূণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল কি না? এ ব্যাপারে তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধানকে এক সমীক্ষার কথা জানানো হয়, যেখানে দাবি করা হয়েছিল যে ভ্রূণ নষ্টের শিকার হয়েছিল গর্ভবতী নারীদের ৮০ শতাংশই! এ কারণেই এ কেন্দ্রে কোনো নারী কাজ করতে চায় না। এমনকি এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিবার এখানে বাস করে না।

এ রকম আলোচনার পর সিপি শাও খানিকটা থতমত খেয়ে গেলেন। এসব প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনি তখন রীতিমতো তোতলাচ্ছিলেন। তাঁর চেহারার অবস্থা হয়েছিল দেখার মতো। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত গলা ঝেড়েকেশে বললেন, *'আসলে এটা গ্রাম এলাকা। এ কারণে এখানকার মেয়েরা কাজ করতে চায় না এ রকম পরিবেশে। অবস্থার পরিবর্তন হবে। আর ভ্রূণ সমস্যাটি আগে ছিল। তবে এখন নেই।'*

সংবাদ সম্মেলন শেষ হলো। আমরা এখন বাসে উঠব। আমাদের এখানেও বারবার বলা হচ্ছিল, নিরাপত্তা সমস্যার কারণে বাইরে যাওয়া যাবে না। আদানি গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমাদেরও বলেছিলেন যে এ এলাকায় আদানির নাম বললে কেউ ফিরেও তাকাবে না। সে যা-ই হোক, আমরা বাসে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। ভলভো বাসে চড়ে আবার পাড়ি দেব ১০০ কিলোমিটার। কিন্তু এখানে আসার সময় যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে র‍্যাডিসনে যেতে যেতে আমাদের রাত দশটা না হলেও নয়টা তো বেজেই যাবে!

আমরা বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি বাসে ওঠার জন্য, ঠিক সেই সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালু করা হলো। আর সাথে সাথেই চিমনি দিয়ে কালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করল। অথচ সংবাদ সম্মেলনে আমাদের জানানো হয়েছিল যে এই চিমনি দিয়ে কোনো ধোঁয়া বের হয় না। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি এভাবে চালু হয়ে যাওয়ায় আদানি পাওয়ারের কর্মকর্তারা যেন চোখে শর্ষে ফুল দেখছিলেন।

তিরোধা কেন্দ্রের ইউনিট-৩ এর পরিচালক বাঙালি প্রকৌশলী অনিমেষ চক্রবর্তী আমাদের অবশ্য জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রটি সেই সময় আসলে বন্ধ ছিল! কিন্তু এটা বন্ধ রাখা হয়েছিল আমাদের আগমন উপলক্ষে কি না সে সম্পর্কে তিনি কিছু বলেননি। তবে তিনি এও বলেন যে ২৭৫ মিটার উঁচু চিমনি দিয়ে যেসব ধোঁয়া ও কয়লার পার্টিকেল বের হয় তাতে ওই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এলাকা আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। এর ক্ষতিকর প্রভাব টের পাওয়া যায় কমপক্ষে দশ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে। আর এই একই কথা তো বলছেন বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরাও। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুন্দরবন থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। এই কেন্দ্র থেকে ক্ষতিকর পার্টিকেলগুলো ছড়িয়ে পড়বে তিরোধা ও সিপাত কেন্দ্রের মতোই দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সুন্দরবনের সর্বত্র।

উৎপাদিত বিদ্যুৎমূল্য, নিজস্ব কয়লাখনি এবং সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি

মহারাষ্ট্রের তিরোধা ও ছত্তিশগড়ের সিপাত– উভয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংশ্লিষ্টরা আমাদের জানিয়েছেন, এ দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন খরচ প্রতি ইউনিটে মাত্র আড়াই রুপি আর বাংলাদেশি মুদ্রায় তা আনুমানিক ৩ টাকা ৫০ পয়সা। ভারতের নিজেদের খনির কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করায় কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে বলে এনটিপিসির সিপাত সুপার থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক ভিবি ফাদনাভিজ আমাদের জানিয়েছেন।

> আদানি গ্রুপ পরিচালিত তিরোধা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানিয়েছেন, একটি সাবক্রিটিক্যাল থেকে সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি এগিয়ে আছে মাত্র ২ শতাংশ। আবার আলট্রা সুপারক্রিটিক্যাল তা থেকে এগিয়ে আছে ৩ শতাংশ। অন্য কথায়, সাবক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের ইফিশিয়েন্সি বা দক্ষতা শতকরা ৩৭ ভাগ, সুপারক্রিটিক্যালের ৩৯ ভাগ আর আল্ট্রাক্রিটিক্যালের প্রযুক্তির বেলায় তা ৪২ ভাগ।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এনটিপিসির সিপাত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ছত্তিশগড়ের সিপাতে। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা আসে পার্শ্ববর্তী দিপীকা খনি থেকে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠান সাউদার্ন ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড (এসইসিএল)- এর খনি থেকে সরসারি ট্রেনে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা চলে আসে। এই খনির কয়লা প্রতি টন ১৪০০ রুপির মতো। অন্যদিকে ভারতের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানি আদানি গ্রুপের মহরাষ্ট্রের গুণ্ডিয়ার তিরোধার ৩৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা আসে আদানি গ্রুপের নিজস্ব খনি মহরাষ্ট্রের লোহারা ও পশ্চিম লোহারা থেকে। এই খনি থেকে সরাসরি ট্রেনে করে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে চলে আসে কয়লা। কম দামে কয়লা পাওয়ার কারণে ওপরের দুটি কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম পড়ে বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় সাড়ে তিন টাকা। নিজেদের খনির কয়লা ছাড়াও আদানি কোল ইন্ডিয়ার সহযোগী প্রতিষ্ঠান ওয়েস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেডের কয়লাও ব্যবহার করে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আদানির নিজস্ব কয়লা খনি থেকেও কয়লা এনে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সিপাত ও তিরোধা– দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির। আগের প্রজন্মের সাবক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির

চেয়ে এতে অন্তত ২ শতাংশ কম কয়লার প্রয়োজন হয়। ফলে এর বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ যেমন কমে, তেমনি স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশের দূষণও বেশ খানিকটা কম হয় বলে দুটি কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীরা দাবি করেন। আদানি গ্রুপ পরিচালিত তিরোধা কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানিয়েছেন, একটি সাবক্রিটিক্যাল থেকে সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি এগিয়ে আছে মাত্র ২ শতাংশ। আবার আল্ট্রা সুপারক্রিটিক্যাল তা থেকে এগিয়ে আছে ৩ শতাংশ। অন্য কথায়, সাবক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের ইফিশিয়েন্সি বা দক্ষতা শতকরা ৩৭ ভাগ, সুপারক্রিটিক্যালের ৩৯ ভাগ আর আল্ট্রাক্রিটিক্যালের প্রযুক্তির বেলায় তা ৪২ ভাগ।

মাত্র ২ শতাংশ কয়লা কম লাগায় পরিবেশের ক্ষতির মাত্রা খুব বেশি কমবে না, তাহলে এমন প্রযুক্তি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে–এমন প্রশ্ন আমরা করেছিলাম তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান সিপি শাওয়ের কাছে। তিনি আমাদের বলেছিলেন, *'নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল না মিলিয়ে যদি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয় আর তার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়, তাহলে মেরামতের জন্য সেগুলো খোলাবাজারে পাওয়া যাবে না। এ কারণে চলতি প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়।'* সিপি শাওয়ের এ বক্তব্যের ভেতরই 'সুপারক্রিটিক্যালের' বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি এও জানান যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে পরিবেশের কিছু ক্ষতি তো মেনে নিতেই হবে। তবে ক্ষতির বিবেচনায় এতে অর্থনৈতিক লাভ অনেক বেশি বলেও তিনি মন্তব্য করেন। অন্য কথায়, এ ধরনের সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির সাথে কোনোভাবেই পরিবেশ ধ্বংস রোধের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত বড় বড় কর্পোরেশন এই সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির ব্যবসা করে মাত্র। নতুন প্রযুক্তির নামে তারা যন্ত্রপাতি বিক্রি করে আরো বেশি দামে।

টাইমস অব ইন্ডিয়া (১১ জুলাই ২০১৪) ও এনডিটিভি (১৮ মার্চ ২০১৪) তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ওই এলাকায় ২০১৩ সালে ৩ হাজার ১৪৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে।

রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সুন্দরবন এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

ভারতের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অধিকাংশের কয়লা আসে নিজেদের খনি থেকে। কিছু কেনা হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে। আগেই আলোচনা করেছি যে এসব কয়লা রেলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে। এতে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি হলেও তারা পারতপক্ষে মানুষশূন্য এলাকায় কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

অন্যদিকে রামপাল কেন্দ্রের জন্য কয়লা নেওয়া হবে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে জাহাজে করে। এখন ডাঙার রেলের কয়লা যদি মাটির ওপরে পড়ে তাহলে অবশ্যই দূষণ হবে। কিন্তু নদীর ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সময় যদি জাহাজ থেকে কয়লা পড়ে এবং পানিকে দূষিত করে, তাহলে সকল জলজ প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। শুধু তা-ই নয়, এই নদীর জলে বেঁচে থাকা সুন্দরবন নিজেও বিপদগ্রস্ত হবে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে রামপাল প্রকল্প বাস্তবায়নকারী পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বা পিডিবি দেশের মানুষকে জানিয়েছে, রামপাল কেন্দ্রের জন্য বছরে ৪৭ লাখ ২০ হাজার টন কয়লা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে। পশুর নদীর গভীরতা কম হওয়ায় সুন্দরবনের আকরাম পয়েন্টে থাকবে কয়লা পরিবাহী মূল জাহাজ। এখান থেকে লাইটার বা ছোট ছোট জাহাজে করে পশুর নদী দিয়ে রামপাল কেন্দ্রে আসবে। প্রতিদিন ১৩ হাজার টন কয়লা প্রয়োজন হবে। আর এ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শেষ হলে এই পরিমাণ হবে ২৬ হাজার টন। এ জন্য সুন্দরবনের ভেতরে হিরন পয়েন্ট থেকে আকরাম পয়েন্ট পর্যন্ত নদীপথে বড় জাহাজ বছরে ৫৯ দিন এবং আকরাম পয়েন্ট থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত প্রায় ৬৭ কিলোমিটার পথ ছোট লাইটারেজ জাহাজে করে বছরে ২৩৬ দিন হাজার হাজার টন কয়লা পরিবহন করতে হবে। জাহাজে করে এই কয়লা পরিবহনেই সুন্দরবনের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, সেটা সরকারের চূড়ান্ত পরিবেশ সমীক্ষা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। কয়লা পরিবহনকারী জাহাজ থেকে কয়লার গুঁড়া, ভাঙা বা টুকরো কয়লা, তেল, ময়লা-আবর্জনা, জাহাজের দূষিত পানিসহ বিপুল পরিমাণ বর্জ্য নিঃসৃত হয়ে নদী-খাল-মাটিসহ গোটা সুন্দরবন দূষিত করে ফেলবে। জাহাজ চলাচলের শব্দদূষণসহ অন্যান্য ঝুঁকি তো রয়েছেই। আর শ্যালা নদীতে সাড়ে তিন লাখ টন ফার্নেস তেল নিয়ে ট্যাংকার ডুবে যাওয়ার পর এই আশঙ্কা কোনো দুঃস্বপ্ন বা আগাম ভয় নয়, এটা এখন প্রমাণিত সত্য।

তবে পিডিবি আশ্বস্ত করতে চেয়েছে যে এসব কয়লাবোঝাই জাহাজের পুরোটাই থাকবে সুরক্ষিতভাবে ঘেরা। অথচ ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার (এনটিপিসি) পরিচালিত ছত্তিশগড়ের সিপাত সুপারক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্লান্ট ও আদানি গ্রুপ পরিচালিত মহারাষ্ট্রের তিরোধা পাওয়ার প্লান্ট ঘুরে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। এই কেন্দ্রের কয়লা আসে ভারতের কয়লাখনি থেকে রেলে করে। মালবাহী রেলের খোলা বগিতে করে কয়লা আনা হয়। ওপরে কোনো ঢাকনা থাকে না। এসব কয়লা বাতাসে উড়ছে, বৃষ্টিতে ভিজে তা মিশে যাচ্ছে রেলটি যেসব স্থান দিয়ে আসছে সেই সব স্থানে। কিন্তু এসব কেন্দ্রের আশপাশে সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর কোনো বাদাবন বা শ্বাসমূলীয় বন না থাকায় তা নিয়ে বিতর্ক উঠলেও সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে ভারত কর্তৃপক্ষ।

আবার পরিবেশবিদরা বারবার বলে আসছেন, কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে পশুর নদীর পানির স্তর নিচে নেমে যাবে। এর ফলে নদীটি মারা যাবে। আর এ নদীর ওপর নির্ভরশীল সুন্দরবনের একটি অংশে মরুকরণ দেখা দেবে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। তার বিপরীতে পিডিবি ও অন্যান্য সরকারি পক্ষ থেকে নানা ধরনের যুক্তি নাগরিকদের সামনে আনা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাস্তবে আসলে কী রকম অবস্থা হয় একটি 'সুপারক্রিটিক্যাল' প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে? অর্থাৎ একটি সুপারক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের ওই অঞ্চলের নদীর ওপর প্রভাব কী তা জানা জরুরি। সে জন্য তিরোধা কয়লা কেন্দ্র যে ওয়াইনগঙ্গা নদী থেকে পানি আহরণ করে থাকে তার প্রভাব কিছুটা অনুধাবন করতে পারলে আমাদের পশুর নদীর ভবিষ্যৎ হাল-হকিকত কী হতে পারে রামপাল প্রকল্পের কারণে, তা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি আসে ১০ কিলোমিটার দূরের ওয়াইনগঙ্গা নদী থেকে। এই নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহ টেনে আনা হয় এখানে। এ বাঁধের কারণে ইতিমধ্যে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। আগে থেকেই এ অঞ্চলটিতে ছিল ভারতের চরম দরিদ্র মানুষের বাস। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি সচল রাখতে আদানি গ্রুপের দরকার হয় প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৬ লাখ লিটার পানি। এই পানি তো আর আসমানের বৃষ্টি দিয়ে পূরণ হবে না, নদী থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। এ জন্যই আদানি গ্রুপের তিরোধা সুপারক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের বিরূপ প্রভাব পড়েছে ওয়াইনগঙ্গা নদীর ওপর।[২] এতে স্থানীয় কৃষকরা শস্য আবাদে ভয়ংকর ক্ষতির শিকার হয়েছে। এই বাঁধসংলগ্ন বিদারবহ এলাকায় সবচেয়ে বেশিসংখ্যক কৃষক আত্মহত্যার পথ

বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে বলে টাইমস অব ইন্ডিয়া (১১ জুলাই ২০১৪) ও এনডিটিভি (১৮ মার্চ ২০১৪) তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ন্যাশনাল ক্রাইমস রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ওই এলাকায় ২০১৩ সালে ৩ হাজার ১৪৬ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে।[৩]

আমরা খানিকটা কৌতূহল নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কারণে ওয়াইনগঙ্গা নদীটি মরে যাওয়ার ব্যাপারে আদানি গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট বি ডি ধরের কাছে। তিনি আমাদের বলেন, 'ওয়াইনগঙ্গার মিষ্টি পানি সাগরে গিয়ে লবণ পানির সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আমরা বরং বাঁধ দিয়ে তা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করছি। বাঁধের কারণে [মিষ্টি] পানি বরং মাটির ভেতরে প্রবেশ করছে।' এটা পরিবেশের জন্য ভালো বলেও তিনি দাবি করেন!

আদানি গ্রুপের এই কেন্দ্রের মতো বাংলাদেশে রামপাল প্রকল্পে এ রকম বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা না থাকলেও সুন্দরবনে অবস্থিত পশুর নদী থেকে পানি প্রত্যাহার করতে হবে। সে জন্য ভারতে ফারাক্কা বাঁধের কারণে ইতিমধ্যে ভুগতে থাকা পশুর নদীর পানির স্তর যে নিচে নেমে যাবে তা বোঝার জন্য পানি বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। বাংলাদেশের পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পানি ব্যবহারের পর পশুর নদীতে আবার তার অবশিষ্ট কিছু পানি ফেরত দেওয়া হবে। এই ফেরত দেওয়া পানির তাপমাত্রা ভিন্ন থাকবে নদীর স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে, যতই অত্যাধুনিক শীতলীকরণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হোক না কেন। এর ফলে পশুর নদীর জলজ প্রতিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান ভেঙে পড়বে। স্বাভাবিকভাবেই পিডিবির কর্মকর্তারা দাবি করছেন, সুপারক্রিটিক্যাল কেন্দ্র থেকে উষ্ণ তাপমাত্রার পানি পশুর নদীতে ফেরত দেওয়া হবে না। বরং পরিশোধিত পানিই কেবল নদীতে যাবে। অবশ্য ভারতের গণমাধ্যম ভিন্ন তথ্য জানাচ্ছে। 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় (৮ আগস্ট ২০১৪) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গুজরাটের কুচ জেলায় আদানি গ্রুপের মুণ্ডা সুপারক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ভিন্ন তাপমাত্রার উষ্ণ পানি সাগরে ফেলার কারণে সেই পানি দূষিত হচ্ছে। এ জন্য গুজরাট হাইকোর্টে জনস্বার্থে একটি মামলাও হয়েছে।[৪]

শুধু তিরোধা বিদ্যুৎ কেন্দ্রেরই এ অবস্থা নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এনটিপিসি পরিচালিত সিপাত কেন্দ্রের ব্যবহারেও পরিবেশকর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এনভায়রোনিক্স ট্রাস্ট এক গবেষণায় দেখিয়েছে, সিপাত বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি থেকে গড়ে প্রতিবছর ২০ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গত হচ্ছে এবং এখান থেকে নির্গত নাইট্রোজেন অক্সাইড ২০ কিলোমিটার দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ছাড়া এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে পার্শ্ববর্তী লীলাগড় নদী থেকে প্রতি ঘণ্টায় সংগৃহীত ৫ লাখ ২৯ হাজার লিটার পানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়েছে।[৫]

শেষ কথা

গত ৯ ডিসেম্বর সুন্দরবনের শ্যালা নদীতে তেল নিঃসরণজনিত দুর্ঘটনা আমাদের জন্য একটি সতকবার্তা। সুন্দরবনের মতো স্পর্শকাতর এলাকার মধ্য দিয়ে জ্বালানি বহনকালে কোনো বিপর্যয় ঘটলে তার প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে তা এরই মধ্যে উপলব্ধি করা গেছে। ওই ঘটনায় সাড়ে তিন লাখ লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ে মহাসর্বনাশ ঘটিয়েছে সুন্দরবনের। ভারী এই তেলের কারণে নদী ও বনের প্রাণী-প্রতিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। তেলের কারণে পানির ভেতর মাছের ডিম, রেণু পোনা, জলজ প্রাণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এর প্রভাব গিয়ে পড়বে খাদ্যচক্রে, ফলে এসবের ওপর নির্ভরশীল কুমির, ডলফিন, শূকর, হরিণসহ সুন্দরবনের গোটা জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। ফার্নেস তেলের ক্ষতির প্রভাব সুন্দরবনের ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

দ্য হিন্দু পত্রিকায় (৮ আগস্ট ২০১৪) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, গুজরাটের কুচ জেলায় আদানি গ্রুপের মুণ্ডা সুপারক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ভিন্ন তাপমাত্রার উষ্ণ পানি সাগরে ফেলার কারণে সেই পানি দূষিত হচ্ছে। এ জন্য গুজরাট হাইকোর্টে জনস্বার্থে একটি মামলাও হয়েছে।

গত ৯ ডিসেম্বর শ্যালা নদীতে তেল ছড়িয়ে পড়ার পর এর প্রভাব সুন্দরবনে কী হতে পারে, তা নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের এক গবেষণায় এমন ভয়ংকর তথ্য পাওয়া গেছে এবং এই গবেষণার আলোকে সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণে কয়েকটি সুপারিশ পেশ করা হয়েছে, যার মধ্যে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে জ্বালানি তেল পরিবহন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া অন্যতম। অথচ সুন্দরবনের পাশেই গড়ে উঠতে থাকা রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা আনয়নের রুট নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই বনের ভেতর দিয়েই। বিবেচনাবোধবর্জিত হয়ে যে ধরনের উন্নত প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে যাঁরা রামপাল প্রকল্প জায়েজ করতে চাইছেন, শ্যালা নদীতে সাড়ে তিন লাখ লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ার পর তাঁদের কাউকেই কিন্তু সেই ধরনের 'উন্নত প্রযুক্তি' নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি।

আরিফুজ্জামান তুহিন: সাংবাদিক
ইমেইল: m.arifuzzaman@gmail.com

তথ্যসূত্রঃ

১. বিস্তারিত জানতে দেখুন: http:// www. thehindu.com /todays-paper/tp-opinion/article1786762.ece

২. আদানি গ্রুপের এ অবৈধ বাঁধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: http://timesofindia.indiatimes.com/city/ nagpur/Illegal-barrage-made-by-Adani-collapses-in-Dec-rains/articleshow/11429675.cms

৩. বিদারবহ এলাকায় আত্মহত্যার সংবাদগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিস্তারিত জানতে দেখুন: http://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/Vidarbha-farmers-will-con...
http://www.nagpurtoday.in/fatal-fact-maharashtra-records-3146-suicides-b...
http://www.ndtv.com/article/india/in-maharashtra-22-farmer-suicides-in-t...

৪. আদানি গ্রুপের সুপারক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের সমুদ্র দূষন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ http://www.thehindu.com/news/national/other-states/gujarat-high-court-notice-to-adani-power-govt/article6292995.ece

৫. এ সংক্রান্ত গবেষণাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ http://www.indiawaterportal.org/sites/indiawaterportal.org/files/regional_imbalance_committee_prayas_note_to_gom_june_2012.pdf